দ্বিতীয় আন্তর্জাতিক আদিবাসী দশক : অর্জন ও বাংলাদেশের আদিবাসীদের অবস্থা

মঙ্গল কুমার চাকমা

সূচনা:

বিশ্বের ৯০টি দেশের ৫ হাজার নৃতাত্ত্বিক জাতিগোষ্ঠীতে বিভক্ত প্রায় ৪০ কোটির অধিক আদিবাসীর বসবাস রয়েছে।তার মধ্যে বাংলাদেশে বসবাস রয়েছে ২০১১ সালের আদমশুমারী অনুসারে ১৫,৮৬,২৩২ জন আদিবাসী।তবে আদিবাসীরা মনে করে যে, তাদের জনসংখ্যা কমপক্ষে ৩০ লক্ষহবে এবং ৫৪টির অধিক জাতি রয়েছে। বিশ্বের দেশে দেশে আদিবাসীরা হলো দরিদ্র জনগোষ্ঠীর মধ্যে সবচেয়ে দরিদ্রতম জনগোষ্ঠী। বিশ্বের মোট জনসংখ্যার ৫% আদিবাসী জনগোষ্ঠী হলেওবিশ্বের মোট দরিদ্র জনগোষ্ঠীর ১৫% হলো আদিবাসী জাতির লোক এবং বিশ্বের৯০ কোটি চরম দারিদ্র গ্রামীণ জনগোষ্ঠীর মধ্যে প্রায় এক-তৃতীয়াংশ হচ্ছে আদিবাসী।[১]বাংলাদেশে প্রকৃত দারিদ্রতার হার ৪০% এর বিপরীতে পার্বত্য চট্টগ্রামে বাঙালি জনগোষ্ঠীর মধ্যে এ হার ৫৮% আর আদিবাসী জুম্ম জনগোষ্ঠীর মধ্যে ৬২%।[২]আদিবাসীরা বৃহত্তর জনগোষ্ঠী কিংবা বসতিকারী জনগোষ্ঠীর আগ্রাসন, আক্রমণ ও উচ্ছেদের কারণে জমি থেকে উৎখাত হয়ে পড়ছে এবং নিজ ভূমিতে পরবাসী জীবনযাপন করছে। তারা নিজেদের ইচ্ছার বিরুদ্ধে অন্য সংস্কৃতি বা সমাজের অঙ্গীভূত হতে চলেছে।বৃহত্তর জাতিগুলো তাদেরকে ভৌগলিক ও পরিবেশগতভাবে অধিকতর ভঙ্গুর ভূখন্ডের দিকে ঠেলে দিয়ে চলেছে। কোনো কোনো ক্ষেত্রে অধিকতর ভঙ্গুর ভূখন্ডের দিকে ঠেলে দিয়ে তাদের হাতে সামান্য পরিমাণে স্বশাসনের অধিকার দিয়ে তাদেরকে সন্তুষ্ট থাকতে বাধ্য করছে।

আন্তর্জাতিক আদিবাসী দশকও জাতিসংঘের কর্মপরিকল্পনা:

১৯৯৩ সালকে জাতিসংঘ আন্তর্জাতিক আদিবাসী বর্ষ ঘোষণা করেছিল। আদিবাসী বর্ষের মূলসুর ছিল "আদিবাসী জাতি ঃ এক নতুন অংশীদারীত্ব"[৩]। জাতিসংঘ সাধারণ পরিষদ ১৯৯৪ সালে রেজুলেশন ৪৯/২১৪ গ্রহণ করে ৯ আগস্টকে আদিবাসী দিবস হিসেবে ঘোষণা করে।মানবাধিকার বিষয়ক বিশ্ব সম্মেলনের সুপারিশমূলে ১৯৯৩ সালের ২১ ডিসেম্বর জাতিসংঘের সাধারণ পরিষদ ১৯৯৫-২০০৪ সাল'কে আন্তর্জাতিক আদিবাসী দশক হিসেবে ঘোষণা করে।কিন্তু প্রথম দশকের অনেক গুরুত্বপূর্ণ লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যকে নিদিষ্ট মাত্রায় এগিয়ে নেয়া সম্ভব না হওয়ায় জাতিসংঘ সাধারণ পরিষদ ১ জানুয়ারি ২০০৫ সালে রেজুলেশন ৫৯/১৭৪ গ্রহণ করে২০০৫-২০১৪ সালকে দ্বিতীয় আন্তর্জাতিক আদিবাসী দশক হিসেবে ঘোষণা করে, যা এ বছর শেষ হতে চলেছে।দ্বিতীয় আন্তর্জাতিক আদিবাসী দশকের মূল প্রতিপ্রাদ্য বিষয় ছিল "কর্মউদ্যোগে ও মর্যাদায় অংশীদারিত্ব"[৪] ।দ্বিতীয় দশকের কর্মপরিকল্পনা হিসেবে জাতিসংঘ কর্তৃক ৫টি লক্ষ্য গ্রহণ করা হয়। এগুলো হলো-

(১) আইন, নীতি, সম্পদ, কর্মসূচী ও প্রকল্প সংক্রান্ত আঞ্চলিক, জাতীয় ও আন্তর্জাতিক পর্যায়ে গ্রহণ, বাস্তবায়ন ও মূল্যায়নের ক্ষেত্রে বৈষম্যহীনতা ও আদিবাসী জনগোষ্ঠীর অন্তর্ভুক্তিকরণ ত্বরান্বিত করা;

(২) স্বাধীন ও পূর্বাবহিত সম্মতির নীতিকে বিবেচনায় রেখে আদিবাসীদের জীবনধারা, তাদের চিরায়ত ভূমি ও ভূখণ্ড, আদিবাসী হিসেবে তাদের সমষ্টিগত অধিকার বা তাদের জীবনের অন্যকোন ক্ষেত্রে তাদের সাংস্কৃতিক সংহতিকে প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে প্রভাবিত করে এমন সকল ক্ষেত্রে সিদ্ধান্ত গ্রহণের বেলায় আদিবাসী জাতিসমূহের পূর্ণাঙ্গ ও ফলপ্রসু অংশগ্রহণ ত্বরান্বিত করা;

(৩) আদিবাসীদের সাংস্কৃতিক ও ভাষাগত বৈচিত্র্যতার প্রতি সম্মান প্রদর্শন অন্তর্ভুক্তকরণেন্যায্যতার ভিত্তিতে ও সাংস্কৃতিকভাবে যথাযথ সঙ্গতিপূর্ণভাবে উন্নয়ন নীতি পুনর্নির্ধারণ করা;

---

[১] *State of the World's Indigenous Peoples*, January 2010 (United Nations publications, Sales No. 09, VI.13).
[২] Socio-Economic Baseline Survey of Chittagong Hill Tracts, Chittagong Hill Tracts Development Facility (CHTDF), UNDP, 8 April 2009
[৩] Indigenous Peoples : A New Partnership
[৪] Partnership for action and dignity

(৪) আদিবাসী নারী, শিশু ও যুব সমাজের প্রতি বিশেষ প্রাধান্য দিয়েসুনির্দিষ্ট লক্ষ্যসহ আদিবাসী জাতিসমূহের উন্নয়নের জন্য অভীষ্ট নীতিমালা, কর্মসূচী, প্রকল্প ও বাজেট গ্রহণ করা; এবং

(৫) আদিবাসীদের সুরক্ষা ও তাদের জীবনমান উন্নয়নের জন্য আইন, নীতি ও পরিচালনা কর্মকাঠামো বাস্তবায়ন সংক্রান্ত আন্তর্জাতিক, আঞ্চলিক ও বিশেষভাবে জাতীয় পর্যায়ে শক্তিশালী পরিবীক্ষণ কর্মব্যবস্থা ও বলিষ্ঠ জবাবদিহিতা গড়ে তোলা।

প্রথম আন্তর্জাতিক আদিবাসী দশকের (১৯৯৫-২০০৪) সময় আদিবাসী জাতিসমূহের সমস্যা সমাধানের ক্ষেত্রে আন্তর্জাতিক সহযোগিতা শক্তিশালীকরণের লক্ষ্য হিসেবে অনেক গুরুত্ব অর্জন সাধিত হয়েছে। এসব অর্জনের মধ্যে রয়েছে (১) আদিবাসী বিষয়ক জাতিসংঘের স্থায়ী ফোরাম গঠন, (২) আদিবাসী জাতিগোষ্ঠীর মানবাধিকার পরিস্থিতি ও মৌলিক স্বাধিনতা সংক্রান্ত বিশেষ প্রতিবেদক (স্পেশাল র‍্যাপোটিয়র) নিয়োগ, (৩) আদিবাসী জাতিগোষ্ঠী বিষয়ক আন্ত:সংস্থা সহায়তা গ্রুপ[৫] গঠন, (৪)৯ আগস্ট আন্তর্জাতিক আদিবাসী দিবসকে বাৎসরিক উদযাপন, (৫) জাতিসংঘের মানবাধিকার বিষয়ক হাই কমিশনার কার্যালয়ে আদিবাসী ফেলোশীপ কর্মসূচী গ্রহণ করা, (৬) মানবাধিকার প্রকল্প পরিচালনার জন্য আদিবাসী জাতিগোষ্ঠীর সংগঠনগুলোকে সহায়তা প্রদান সংক্রান্ত একটি স্বেচ্ছাসেবী তহবিল[৬] গঠন করা ইত্যাদি অন্যতম।[৭]

প্রথম আদিবাসী দশকের শেষে এটা লক্ষ করা গেছে যে, সংলাপ গড়ে তোলা ও সচেতনতা-বৃদ্ধিকরণের জন্য আদিবাসী জাতিসমূহ জাতিসংঘ কাঠামোকে ফলপ্রসুভাবে ব্যবহার করলেও জাতিসংঘের বিভিন্ন সংস্থা ও অনুমোদিত সংগঠনগুলোর নীতিমালার উপর এবং কর্মসূচী ও প্রকল্পগুলো প্রকৃত বাস্তবায়নের উপর কেবলমাত্র বিচ্ছিন্ন ও বিক্ষিপ্ত সুফল অর্জন করেছে। এজন্য দ্বিতীয় আদিবাসী দশকের সময় "কর্মউদ্যোগ-ভিত্তিক কর্মসূচী[৮] ও সুনির্দিষ্ট প্রকল্প গ্রহণ, অধিকতর কারিগরী সহায়তা প্রদান এবং সংশ্লিষ্ট মানদণ্ড-নির্ধারণী কার্যক্রম গ্রহণের মাধ্যমে সংস্কৃতি, স্বাস্থ্য, মানবাধিকার, পরিবেশ ও সামাজিক এবং অর্থনৈতিক উন্নয়নের ক্ষেত্রে আদিবাসীদের সম্মুখীন হওয়াসমস্যার সমাধানে অধিকতর পরিমাণে আন্তর্জাতিক সহযোগিতা বৃদ্ধি করার লক্ষ্য হাতে নেয়া হয়েছে।এক্ষেত্রে রেজুলেশন ৫৯/১৭৪ মাধ্যমেসাধারণ পরিষদের অনুরোধক্রমে জাতিসংঘ মহাসচিব কর্তৃক দ্বিতীয় দশকের সমন্বয়কারী হিসেবে অর্থনৈতিক ও সামাজিক বিষয়ক সহকারী মহাসচিবকে নিয়োগ দেয়া হয়।

রেজুলেশন ৬০/১৪২ মাধ্যমেজাতিসংঘ সাধারণ পরিষদ দ্বিতীয় দশকের কর্মউদ্যোগের একটি নির্দেশনা/রূপরেখা হিসেবে দ্বিতীয় আন্তর্জাতিক আদিবাসী দশকের কর্মপরিকল্পনা গ্রহণ করে। এই কর্মপরিকল্পনায় সকল স্তরের জাতিসংঘের সদস্য-রাষ্ট্র, জাতিসংঘের বিশেষায়িত সংস্থা, আন্তর্জাতিক ও আন্তঃরাষ্ট্রীয় সংস্থা, আদিবাসী জাতিগোষ্ঠী ও সুশীল সমাজেরসংগঠন, বেসরকারি সংস্থাসমূহের উদ্দেশ্যে বিভিন্ন সুপারিশ রয়েছে এবং দ্বিতীয় দশকের জন্য বিভিন্ন ইস্যু উল্লেখ রয়েছে।

আন্তর্জাতিক আদিবাসী দশক ও আন্তর্জাতিক স্তরে অর্জন:

বৈষম্যহীনতা, নাগরিক অধিকারের অন্তর্ভুক্তিকরণ ও পূর্ণ বাস্তবায়ন এবং রাষ্ট্রীয় জীবনে সমতা তথা আন্ত:রাষ্ট্রীয় কার্যক্রমে অংশগ্রহণ ছিল দ্বিতীয় আদিবাসী দশকের মূল উপাদান এবং আন্তর্জাতিক আইনের একটি মৌলিক মানবাধিকারের মূল্যবোধ যা স্পষ্টভাবে আন্তর্জাতিক মানবাধিকার আইনগুলোতে সন্নিবেশ করা হয়েছে। আদিবাসী জাতিগোষ্ঠীর অধিকার বিষয়ক জাতিসংঘ ঘোষণাপত্রে এই মূল্যবোধ পুনর্ব্যক্ত করা হয়েছে এবং আদিবাসী জাতিগোষ্ঠীর প্রেক্ষাপটে এর তাৎপর্য পর্যালোচনা করা হয়েছে। ২০ বছরের অধিক সময় ধরে দেনদরবারের পর সাধারণ পরিষদ কর্তৃক ৬১/২৯৫ রেজুলেশনের মাধ্যমে এই ঘোষণাপত্র গ্রহণ করা দ্বিতীয় আদিবাসী দশকের একটি অন্যতম অর্জন বলে বিবেচনা করা যায়। যদিও এই ঘোষণাপত্র গ্রহণের সময় কিছু সংখ্যক রাষ্ট্র ভোট দানে বিরত থাকে এবং কতিপয় রাষ্ট্র এর বিরুদ্ধে ভোট প্রদান করে, তা সত্ত্বেও এসব রাষ্ট্রের মধ্যেঅনেক রাষ্ট্র পরবর্তীতে তাদের অবস্থান পরিবর্তন

[৫] Inter-Agency Support Group
[৬] Voluntary Fund
[৭] E/CN.4/2005/87
[৮] Action-orientded programme

করছেএবং এই ঘোষণাপত্রের প্রতি সমর্থন প্রদান করছে।অস্ট্রেলিয়া, কলম্বিয়া ও সোমালিয়া তাদের অবস্থান পরিবর্তন করে ২০০৯ সালে ঘোষণাপত্রের প্রতি সমর্থন জানিয়েছে এবং ২০১০ সালে নিউজিল্যাণ্ডও সমর্থন করেছে।[৯]ঘোষণাপত্র গৃহীতকরণের সময় বাংলাদেশও ভোট দানে বিরত থাকে। অন্যান্য অনেক রাষ্ট্র তাদের অবস্থান পরিবর্তন করে ঘোষণাপত্রের প্রতি সমর্থন প্রদান করলেও বাংলাদেশ এখনো সমর্থন প্রদান থেকে বিরত রয়েছে। ২০০৯ সালের আন্তর্জাতিক আদিবাসী দিবস উপলক্ষ্যে প্রধানমন্ত্রী হিসেবে শেখ হাসিনার দেয়া শুভেচ্ছা বার্তায় এই ঘোষণাপত্র বাস্তবায়নের জন্য একসাথে কাজ করার কথা[১০] উল্লেখ থাকলেও সরকার এ বিষয়ে কোন পদক্ষেপ নেয়নি। এটা আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে বাংলাদেশের ভাবমুর্তিকে ক্ষুন্ন করছে বলে নির্দ্বিধায় বলা যায়।

অনেক রাষ্ট্রে আদিবাসী জাতিসমূহের ব্যক্তিগত ও সমষ্টিগত অধিকার স্বীকৃতি প্রদানের ক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য অগ্রগতি সাধিত হয়েছে। কতিপয় রাষ্ট্রে, প্রধানত: ল্যাতিন আমেরিকায়, আদিবাসী অধিকার বিষয়ক ঘোষণাপত্রটি দেশের সাংবিধানিক সংস্কার প্রক্রিয়ার অবিচ্ছেদ্য অংশ হিসেবে গ্রহণ করেছে। উদহারণ স্বরূপ, ২০০৭ সালে বলিভিয়ায় যাকে এখন বহুজাতিক রাষ্ট্র[১১] হিসেবে আখ্যায়িত করা হয়, সেখানে জাতীয় আইন হিসেবে এই ঘোষণাপত্রকে গ্রহণ করা হয়েছে। ২০০৮ সালে ইকোয়েডর নতুন সংবিধান প্রণয়ন করে যেখানে ১নং অনুচ্ছেদে ইকোয়েডরকে একটি আন্ত:সাংস্কৃতিক ও বহুজাতিক রাষ্ট্র হিসেবে বলা হয়েছে এবং ৫৭নং অনুচ্ছেদে আদিবাসীদের তাদের সংগঠনের প্রথাগত কাঠামো, রাজনৈতিক অংশগ্রহণ ও রাষ্ট্রীয় প্রতিনিধিত্বের ক্ষেত্রে আদিবাসী জাতিগোষ্ঠী, সম্প্রদায় ও জাতির অধিকার সমন্বিত করা হয়েছে।

বিশ্বের বিভিন্ন অঞ্চলে অনেক রাষ্ট্র আদিবাসীদের স্বীকৃতি ও অন্তর্ভুক্তিকরণ, আত্মনিয়ন্ত্রণ-ভিত্তিক শাসনব্যবস্থা, জাতীয়ভাবে ক্ষমা প্রার্থনার মাধ্যমে পুনর্নির্মাণের প্রক্রিয়া শুরু হয়েছে। ২০০৯ সালে আইনু জনগোষ্ঠীকে জাপানের আদিবাসী জাতি হিসেবে জাপান স্বীকৃতি দিয়েছে। ২০০৯ সালে গ্রীনল্যাণ্ড সরকার আন্তর্জাতিক আইনের অধীনে গ্রীনল্যাণ্ডীয় জনগণের"আত্মনিয়ন্ত্রণাধিকারের সাথে সঙ্গতি রেখে একটি নতুন স্বশাসিত সরকার আইন" প্রবর্তন করে। সুইডেন, নরওয়ে ও ফিনল্যাণ্ডে স্বশাসিত প্রতিষ্ঠানগুলোর সমন্বিতকরণ ও শক্তিশালীকরণসহ আদিবাসীদের প্রভাবিত এমন সকল বিষয়ে তাদের পরামর্শ ও মতামত গ্রহণ নিশ্চিত করতে জাতীয় আইন সংস্কারের প্রক্রিয়া শুরু হয়েছে এবং জোরদার হয়েছে। ২০০৮ সালে অতীতের একীভূতকরণ কার্যক্রমের প্রেক্ষিতে আদিবাসী শিশুদের ধারাবাহিক মানবাধিকার লঙ্ঘনের জন্য অস্ট্রেলিয়া ও কানাডা সরকার আদিবাসীদের কাছে জাতীয় ক্ষমা প্রার্থনা করে।[১২]রাশিয়ায় ২০০৮ সালে রাশিয়া ফেডারেশন তথা আন্ত:আর্টিক সম্মেলনে উত্তরাঞ্চল ও দূর-প্রাচ্য অঞ্চলেআঞ্চলিক সরকারগুলোতে আদিবাসীদের প্রতিনিধিত্ব নিশ্চিত করার লক্ষ্যে মুরমানস্ক অঞ্চলে সামি জনগোষ্ঠীর প্রথম কংগ্রেস স্থাপন করা হয়। নেপাল ও ইকোয়েডর এর মতো কতিপয় রাষ্ট্রে আদিবাসীদের রাজনৈতিক দল গঠনের উদাহরণ রয়েছে।[১৩]

আদিবাসীদের সরাসরি রাজনৈতিক অংশগ্রহণ ও প্রতিনিধিত্বের গুরুত্বকে স্বীকার করে আন্ত:পার্লামেন্টারী ইউনিয়ন ও ইউএনডিপি অন্তর্ভুক্তিমূলক পার্লামেন্ট ত্বরান্বিত করার জন্য একটি প্রকল্প হাতে নিয়েছে। জাতিসংঘ নারী উন্নয়ন তহবিলের পক্ষ থেকেদক্ষিণ বলিভিয়ায় আদিবাসী নারীদের রাজনৈতিক অন্তর্ভুক্তিকরণ প্রক্রিয়ায় সহায়তা দেয়া হয়েছে। এর ফলে আদিবাসী নারীদের জনমত গঠনের দক্ষতা এবং তাদের রাজনৈতিক অংশগ্রহণ বৃদ্ধি পাচ্ছে।[১৪] জাতিসংঘের আদিবাসী বিষয়ক স্থায়ী ফোরামও উচ্চ পর্যায়ের একটি ফোরাম হিসেবে সেখানে আদিবাসীদের সমস্যা ও দাবি-দাওয়াতুলে ধরা এবং এসব বিষয়ে সচেতনতা বৃদ্ধি করা ও সহস্রাব্ধ উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রাসহ উন্নয়ন প্রক্রিয়ায় তাদের অন্তর্ভুক্তিকরণের প্রয়োজনীয়তার কথা উচ্চারনের মাধ্যমে উল্লেখযোগ্য ভূমিকা রাখছে।কৃষি উন্নয়ন বিষয়ক আন্তর্জাতিক তহবিল[১৫]একটি নিজস্ব আদিবাসী নীতিমালা প্রণয়ন করেছে যেখানে স্বাধীন ও পূর্বাবহিত সম্মতির নীতি স্বীকৃতি দেয়া

[৯]A/65/166
[১০]সংহতি-২০০৯, সম্পাদনা- সঞ্জীব দ্রং, বাংলাদেশ আদিবাসী ফোরাম, ঢাকা।
[১১]Plurinational State
[১২]A/65/166
[১৩]Ibid
[১৪]Annual report 2009 to UNPFII and UNIFEM;
www.un.org/esa/spcdev/unpfii/documents/UNIFEM_report_8th_session_en.pdf
[১৫]International Fund for Agricultural Development (IFAD)

হয়েছে এবং সংগঠনের মধ্যে একটি আদিবাসী পরামর্শক গ্রুপ গঠন করার ব্যবস্থা নিয়েছে।[১৬]জাতিসংঘের মানবাধিকার কর্মব্যবস্থার সংস্কারের ফলে জাতিসংঘের মানবাধিকার পরিষদ ১৪ ডিসেম্বর ২০০৭ সালে রেজুলেশন ৬/৩৬ এর মাধ্যমে আদিবাসী জাতিগোষ্ঠীর অধিকার বিষয়ক বিশেষজ্ঞ কর্মব্যবস্থা[১৭] স্থাপন করেছে।

প্রথম আন্তর্জাতিক আদিবাসী দশকে আন্তর্জাতিক ও জাতীয় পর্যায়ে যে সফলতা অর্জিত হয়েছে তা ছিল কেবলমাত্র জাতিসংঘের নীতিগত ক্ষেত্রে বিচ্ছিন্ন ও বিক্ষিপ্ত প্রভাব। দ্বিতীয় দশকের সময় আদিবাসী জাতিগোষ্ঠীর অধিকার বিষয়ক জাতিসংঘ ঘোষণাপত্র গ্রহণের মতো বড় ধরনের সফলতা অর্জিত হলেও তা রয়ে গেছে মূলত: নীতিগত পর্যায়ে। গৃহীত নীতিমালা ও দ্বিতীয় দশকের সুনির্দিষ্ট লক্ষ্য প্রকৃত বাস্তবায়নের মধ্যে এখনো বড় ধরনের ব্যবধান বিদ্যমান রয়েছে। তাই সাধারণভাবে অনেক দেশে আদিবাসী জাতিগোষ্ঠীসমূহ, বিশেষ করে আদিবাসী নারীরা এখনো আনুষ্ঠানিক স্বীকৃতি ও প্রত্যক্ষ রাজনৈতিক অংশগ্রহণসহ মৌলিক মানবাধিকার থেকে বঞ্চিত হচ্ছে। যেমন-

(১) এশিয়া ও প্রশান্ত মহাসাগরীয় অঞ্চলে ৭০% আদিবাসী বাস করে। কিন্তু এখনো এসব অঞ্চলের মাত্র হাতে গোনা কয়েকটি রাষ্ট্র সেসব দেশের আদিবাসী জাতিগোষ্ঠীর অস্তিত্বকে স্বীকার করেছে এবং অধিকাংশ রাষ্ট্রে জাতীয় আইনব্যবস্থায় আদিবাসী জাতিসমূহের রাজনৈতিক অংশগ্রহণ ও প্রতিনিধিত্ব হয় এখনো খুবই কম নয়তো একেবারেই নেই।[১৮]আফ্রিকার ক্ষেত্রে অধিকাংশ আদিবাসী জাতিসমূহ এখনো রাষ্ট্রীয়ভাবে অস্বীকৃত রয়ে গেছে। এর ফলে ভূমি ও প্রাকৃতিক সম্পদের উপর তাদের অধিকার প্রায়ই অস্বীকার করা হয়ে থাকে।[১৯]

(২) দ্বিতীয় দশকের মধ্যে ২০০৭ সালে আদিবাসী জাতিগোষ্ঠীর অধিকার বিষয়ক জাতিসংঘ ঘোষণাপত্র গৃহীত হলেও এই ঘোষণাপত্র বাস্তবায়নে রাষ্ট্রীয় পর্যায়ে এখনো বড় চ্যালেঞ্জ হিসেবে রয়ে গেছে। অধিকাংশ রাষ্ট্র এখনো ঘোষণাপত্রটি কার্যকর বাস্তবায়নের কোন উদ্যোগ গ্রহণ করেনি। রাষ্ট্রীয় পর্যায়ে নীতি-নির্ধারকদের মধ্যে ঘোষণাপত্র বিষয়ে ধারণা ও কারিগরী জ্ঞানের অভাব এই ঘোষণাপত্র বাস্তবায়নে বড় বাধা হিসেবে কাজ করছে।

(৩) যদিও কর্মসূচী পর্যায়ে বিশেষ করে আন্ত:সরকারী সংস্থায় বিভিন্ন কর্মসূচী ও কার্যক্রমে আদিবাসীদের অংশগ্রহণ ও অন্তর্ভুক্তিকরণ বৃদ্ধি পেয়েছে, কিন্তু এখনো আদিবাসীদের প্রভাবিত করে এমন আন্তর্জাতিক প্রতিষ্ঠান, উন্নয়ন কর্মসূচী ও প্রকল্প-সংশ্লিষ্ট কার্যক্রমে আদিবাসীদের প্রত্যক্ষ অংশগ্রহণের ধারাবাহিক সম্পৃক্তকরণ ও কর্মব্যবস্থা গ্রহণের বড় ধরনের অভাব রয়েছে।

(৪) যদিও রাষ্ট্রগুলো জাতিসংঘের বিভিন্ন সংস্থার সাথে, বিশেষ করে আইএলও, ইউএনডিপি, ইউনিসেফ, জাতিসংঘ জনসংখ্যা তহবিল, ইউনিফেম, আইফাড ও অন্যান্যদের সাথে আদিবাসীদের উন্নয়নে ক্রমবর্ধমান হারে কাজ করছে, কিন্তু এগুলো এখনো এডহক ভিত্তিক, নীতিমালা ও কর্মসূচী পর্যায়ে রয়ে গেছে। এগুলো এখনো কর্মউদ্যোগ-ভিত্তিক কর্মসূচীতে রূপান্তর ঘটেনি।

(৫) এখনো পর্যন্ত আদিবাসী ভাষায় পর্যাপ্ত তথ্য লভ্যতা ও লাভের অভাব আদিবাসীদের অর্থবহ অংশগ্রহণ ত্বরান্বিতকরণে এবং জাতীয় নীতি-নির্ধারণী ও উন্নয়ন কার্যক্রমে তাদের প্রকৃত ও পূর্বাবহিত পূর্বক অংশগ্রহণের ক্ষেত্রে একটি অন্যতম বাধা হিসেবে বিরাজমান রয়েছে। স্কান্ডিনাভিয়া ও দক্ষিণ আমেরিকার কিছু রাষ্ট্রে আদিবাসী ভাষাগুলোকে জাতীয় ভাষা হিসেবে এবং শিক্ষাব্যবস্থায় ব্যবহারের ঘোষণা করা হলেও বিশ্বের অধিকাংশ দেশে ও আন্তর্জাতিক সংস্থার কার্যক্রমে আদিবাসী ভাষা অস্বীকৃত থেকে গেছে।

দ্বিতীয় আদিবাসী দশক ও বাংলাদেশ সরকার

বাংলাদেশ সরকার "আদিবাসী" নামে আদিবাসীদের অস্তিত্ব স্বীকার করে না।সংবিধানের পঞ্চদশ সংশোধনীর মাধ্যমে সরকার তাদেরকে "উপ-জাতি, ক্ষুদ্র জাতিসত্তা, নৃ-গোষ্ঠী ও সম্প্রদায়" হিসেবে আখ্যায়িত করেছে। তবে কোন কোন

[১৬]www.ifad/english/indigenous/documents/ip_pilicy_e.pdf
[১৭]Expert Mechanism on the Rights of Indigenous Peoples (EMRIP)
[১৮]The Indigenous World 2008, International Work Group for Indigenous Peoples Affairs,
[১৯]"The Rights of indigenous peoples in 24 African countries", study report of ILO and African Commission on Human and Peoples' Rights, 2009

ক্ষেত্রে "জাতিগত সংখ্যালঘু" বা "Ethnic Minority"হিসেবেও উল্লেখ করা হয়ে থাকে। এটা বিশেষভাবে উল্লেখ্য যে, দেশে প্রচলিত অনেক আইনে যেমন- পূর্ববঙ্গ জমিদারী দখল ও প্রজাস্বত্ব আইন ১৯৫০, পার্বত্য চট্টগ্রাম শাসনবিধি ১৯০০, অর্থ আইন ১৯৯৫, ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠী সাংস্কৃতিক প্রতিষ্ঠান আইন ২০১০, পার্বত্য চট্টগ্রাম আঞ্চলিক পরিষদ আইন ১৯৯৮, তিন পার্বত্য জেলা পরিষদ আইন ১৯৮৯প্রভৃতি আইনে "aborginals", "indigenous hillmen", "tribe", "আদিবাসী", "উপজাতি", "ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠী", "ক্ষুদ্র জাতিসত্তা" ইত্যাদি নামে উল্লেখ রয়েছে।

যেহেতু সরকার 'আদিবাসী' হিসেবে স্বীকার করে না, তাই সরকার জাতিসংঘ ঘোষিত দ্বিতীয় আন্তর্জাতিক আদিবাসী দশকের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য বাস্তবায়নের নিমিত্তে কোন কার্যক্রমও হাতে নেয়নি। তবে আদিবাসী দশক চলাকালে বাংলাদেশ সরকার আদিবাসীদের উন্নয়নে কিছু কার্যক্রম বাস্তবায়নের উদ্যোগ গ্রহণ করেছে যা দ্বিতীয় আন্তর্জাতিক আদিবাসী দশকের প্রথমলক্ষ্য-"আইন, নীতি, সম্পদ, কর্মসূচী ও প্রকল্প সংক্রান্ত আঞ্চলিক, জাতীয় ও আন্তর্জাতিক পর্যায়ে গ্রহণ, বাস্তবায়ন ও মূল্যায়নের ক্ষেত্রে বৈষম্যহীনতা ও আদিবাসী জনগোষ্ঠীর অন্তর্ভুক্তিকরণ ত্বরান্বিত করার"লক্ষ্য বাস্তবায়নের সাথে সম্পৃক্ত করা যেতে পারে। বাংলাদেশ সরকারের এসব উদ্যোগছিল মূলত: নীতিও পরিকল্পনা প্রণয়ন পর্যায়ে।গৃহীত সেসব নীতিমালা ও পরিকল্পনা বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে আরো কর্মউদ্যোগ-ভিত্তিক কর্মসূচী গ্রহণ ও প্রকৃত বাস্তবায়নের কার্যকর উদ্যোগ নেয়ার প্রয়োজন রয়েছে।

যেহেতু প্রথম আন্তর্জাতিক আদিবাসী দশকের সফলতাগুলো ছিল বস্তুত: বিচ্ছিন্ন ও বিক্ষিপ্ত, সেজন্যদ্বিতীয় আদিবাসী দশকের মূল লক্ষ্য হলো "কর্মউদ্যোগ-ভিত্তিক কর্মসূচী এবং সুনির্দিষ্ট প্রকল্প, বর্ধিত কারিগরী সহায়তা ও সংশ্লিষ্ট মান-নির্ধারণী কার্যক্রমের মাধ্যমে সংস্কৃতি, শিক্ষা, স্বাস্থ্য, মানবাধিকার এবং সামাজিক ও অর্থনৈতিক উন্নয়নের ক্ষেত্রে আদিবাসীরা যে সমস্যার সম্মুখীন হয় তা সমাধানের জন্য আন্তর্জাতিক সহযোগিতার অধিকতর শক্তিশালী করা"। এ লক্ষ্য বাস্তবায়নের জন্য আন্তর্জাতিক, আঞ্চলিক ও জাতীয় পর্যায়ে কর্মউদ্যোগ গ্রহণের জন্য সংস্কৃতি, শিক্ষা, স্বাস্থ্য, মানবাধিকার এবং সামাজিক ও অর্থনৈতিক উন্নয়ন বিষয়ে কর্মপরিকল্পনা ঘোষণা করে। উক্ত কর্মপরিকল্পনা অনুসারে সংস্কৃতি, শিক্ষা, স্বাস্থ্য, মানবাধিকার এবং সামাজিক ও অর্থনৈতিক উন্নয়নের ক্ষেত্রে বাংলাদেশ সরকার কি কি পদক্ষেপ নিয়েছে তা খতিয়ে দেখা যেতে পারে।

(১) সংস্কৃতি:

জাতিসংঘের কর্মপরিকল্পনায় উল্লেখ করা হয়েছে যে, "আদিবাসীদের সাংস্কৃতিক বৈচিত্র্যতাকে সমর্থন ও উৎসাহিতকরণ, আদিবাসীদের ভাষা এবং স্বাতন্ত্র পরিচিতি সংরক্ষণ ও প্রচলনের ...সুপারিশ করা হয়েছে যাতে লক্ষ্যার্জনে আদিবাসীদের নিজস্ব পদ্ধতি ও উপায় প্রয়োগ সম্পন্ন হতে পারে।" এক্ষেত্রে বাংলাদেশ সরকারের উল্লেখযোগ্য কর্মউদ্যোগ যেটা বলা যেতে পারে তা হলো- ৩০ জুন ২০১১ জাতীয় সংসদে গৃহীত সংবিধানের পঞ্চদশ সংশোধনীর মাধ্যমে '২৩ক' নামে একটি নতুন অনুচ্ছেদ সংযোজন করে আদিবাসীদের 'অনন্য বৈশিষ্ট্যপূর্ণ আঞ্চলিক সংস্কৃতি এবং ঐতিহ্য সংরক্ষণ, উন্নয়ন ও বিকাশের' বিধান করা।উক্ত ২৩ক অনুচ্ছেদে বলা হয়েছে যে, "উপজাতি, ক্ষুদ্রজাতিসত্ত্বা, নৃ-গোষ্ঠী ও সম্প্রদায়ের সংস্কৃতি।- রাষ্ট্র বিভিন্ন উপজাতি, ক্ষুদ্র জাতিসত্ত্বা, নৃ-গোষ্ঠী ও সম্প্রদায়ের অনন্য বৈশিষ্ট্যপূর্ণ আঞ্চলিক সংস্কৃতি এবং ঐতিহ্য সংরক্ষণ, উন্নয়ন ও বিকাশের ব্যবস্থা গ্রহণ করিবেন।"বিতর্ক বা ত্রুটি সত্ত্বেও এই '২৩ক' অনুচ্ছেদের মাধ্যমে এটাই প্রথম যেখানে সংবিধানে আদিবাসীদের সম্পর্কে উল্লেখ করা হয়েছে।

উল্লেখ্য, আদিবাসী জনগণ পঞ্চদশ সংশোধনীর মাধ্যমে প্রদত্ত জাতিগত পরিচিতির অভিধাগুলো "উপজাতি, ক্ষুদ্র জাতিসত্ত্বা, নৃ-গোষ্ঠী ও সম্প্রদায়" ইত্যাদি গ্রহণ করেনি। দ্বিতীয়ত: উক্ত সংশোধনীর মাধ্যমে আদিবাসীদের কেবলমাত্র "অনন্য বৈশিষ্ট্যপূর্ণ আঞ্চলিক সংস্কৃতি এবং ঐতিহ্য সংরক্ষণ, উন্নয়ন ও বিকাশের" স্বীকৃতি প্রদান করা হয়েছে। বস্তুত: সংস্কৃতি ও ঐতিহ্য সংরক্ষণের বিষয়টি বিচ্ছিন্নভাবে দেখার কোন সুযোগ নেই। আদিবাসীদের সংস্কৃতি ও ঐতিহ্য সংরক্ষণ ও সুরক্ষার সাথে তাদের আত্মনিয়ন্ত্রণাধিকার, ভূমি অধিকার, সকল ক্ষেত্রে অর্থবহ অংশগ্রহণ, সিদ্ধান্ত-নির্ধারণী ভূমিকা এবং স্বাধীন ও পূর্বাবহিত সম্মতির অধিকারসমূহঅবিচ্ছেদ্যভাবে সম্পৃক্ত রয়েছে। এসব অধিকার ছাড়া পৃথক বা বিচ্ছিন্নভাবে সংস্কৃতি ও ঐতিহ্য সংরক্ষিত ও সুরক্ষিত হতে পারে না। তাই আদিবাসী সংগঠনগুলো সংবিধান সংশোধনের মাধ্যমে আদিবাসী জাতিসমূহের আশা-আকাঙ্ক্ষা ও দাবি-দাওয়ার ভিত্তিতে আদিবাসী জাতিসমূহের জাতিসত্তা, রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক, ভূমি অধিকারসহ মৌলিক অধিকারের স্বীকৃতি প্রদানের দাবি জানিয়ে আসছে।

বাংলাদেশ সরকারের আরেকটিকার্যক্রম উল্লেখ করা যেতে পারে সেটা হলো ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠী সাংস্কৃতিক প্রতিষ্ঠান আইন ২০১০ প্রণয়ন করা। দেশের বিভিন্ন ক্ষুদ্র নৃ-গোষ্ঠী ও সম্প্রদায়ের অনন্য বৈশিষ্ট্যপূর্ণ আঞ্চলিক সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য সংরক্ষণ, উন্নয়ন ও বিকাশের লক্ষ্যে ক্ষুদ্র নৃ-গোষ্ঠীর সাংস্কৃতিক প্রতিষ্ঠান প্রতিষ্ঠা ও আনুষঙ্গিক বিষয়াদি সম্পর্কে এই আইন প্রণীত হয়েছে বলে প্রস্তাবনায় উল্লেখ রয়েছে।উক্ত ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠী সাংস্কৃতিক প্রতিষ্ঠান আইনের তফসিলে ত্রুটিপূর্ণভাবে কেবলমাত্র ২৭টি জাতির নাম উল্লেখ রয়েছে। আদিবাসীদের মতে দেশে ৫৪টির অধিক আদিবাসী জাতি রয়েছে। ফলে প্রায় অর্ধেকাংশ আদিবাসী জাতি উক্ত তালিকা থেকে বাদ পড়ে যায়। বাদপড়া জাতিসমূহ নানাভাবে হয়রানি ও বৈষম্যের শিকার হচ্ছে বলে অভিযোগ রয়েছে। ত্রুটিপূর্ণ তালিকার কারণে গত ২০১১ সালের আদমশুমারীতে আদিবাসীদের প্রকৃত জনগণনা সঠিকভাবে সম্পন্ন হয়নি এবং বাদপড়া জাতিসমূহ প্রধানমন্ত্রী কার্যালয়ের বিশেষ কার্যাদি বিভাগের উন্নয়ন সুবিধা থেকেও বঞ্চিত হচ্ছে। তবে সম্প্রতি সংস্কৃতি মন্ত্রণালয় কর্তৃক আদিবাসী জাতিসমূহের চিহ্নিতকরণের উদ্যোগ গ্রহণ করেছে, যা নি:সন্দেহে ইতিবাচক বলা যেতে পারে। এখানে আরেকটি বিষয় উল্লেখ করা যেতে পারে তা হলো আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা ইনস্টিটিউটের উদ্যোগে আদিবাসী ভাষাসমূহের জরিপ কার্যক্রম হাতে নেয়া। তবে এই জরিপ কার্যক্রম কিভাবে, কোন পদ্ধতিতে ও কোন কোন জাতির ভাষা নিয়ে পরিচালিত হবে তা এখনো আদিবাসীদের কাছেঅজ্ঞাত রয়ে গেছে।

জাতিসংঘের কর্মপরিকল্পনায় সংস্কৃতি বিষয়ে আরো একটি বিষয় উল্লেখ রয়েছে যে, "যেসব কার্যক্রম ও উদ্যোগ আদিবাসীদের সংস্কৃতিব সাথে সম্পর্কিত তা আদিবাসীদের পরামর্শ, স্বাধীন ও পূর্বাবহিত সম্মতির নীতি অনুসারে পরিচালনা করার সুপারিশ করা হয়েছে।" কিন্তু সরকারের উল্লেখিত কর্মউদ্যোগ হাতে নেয়ার পূর্বে আদিবাসীদের সাথে সরকার কোন পরামর্শ বা স্বাধীন ও পূর্বাবহিত সম্মতি গ্রহণ করেনি। বিশেষ করে ২০১১ সালে পঞ্চদশ সংশোধনীর সময় সংবিধান সংশোধন সংক্রান্ত বিশেষ কমিটি আদিবাসীদের সাথে কোন আলোচনা করেনি। এমনকি ২০১০ সালে ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠী সাংস্কৃতিক প্রতিষ্ঠান আইন প্রণয়নের সময়ও আদিবাসীদের সাথে কোন পরামর্শ অনুষ্ঠিত করা হয়নি।কেবলমাত্র বর্তমানে চলমানসংস্কৃতি মন্ত্রণালয়ের আদিবাসী জাতিসমূহের চিহ্নিতকরণের কার্যক্রমে আদিবাসী প্রতিনিধি ও আদিবাসী বিশেষজ্ঞদের মতামত নিচ্ছে বলে জানা যায়।

জাতিসংঘের কর্মপরিকল্পনায় আরো উল্লেখ ছিল যে, "আদিবাসীদের সংস্কৃতিক ব্যাপারে অআদিবাসীদের একগুঁয়ে ও নিকৃষ্ট ধারণা দূর করার রাষ্ট্রসমূহ বিভিন্ন ধরনের পদক্ষেপ ও কার্যক্রম গ্রহণ ...অনুরোধ করা হয়েছে। এ প্রক্রিয়ায় গণমাধ্যমে ভূমিকা খুবই গুরুত্বপূর্ণ।" এ বিষয়ে পাঠ্যবই থেকে আদিবাসীদের সম্পর্কে অসম্মান ও অপমানজনক বক্তব্য বাদ দেয়ার সরকারী উদ্যোগ নেয়া হয়েছে। তবে এখনো এই উদ্যোগ চূড়ান্ত বাস্তবায়ন সম্পন্ন হয়নি।আদিবাসীদের সংস্কৃতি বিষয়ে ভুল ধারনা ভেঙ্গে দেয়া এবং মানবাধিকার বিষয়ে অধিকাংশ গণমাধ্যমের ভূমিকা অত্যন্ত প্রশংসনীয় এবং আগের যে কোন সময়ের তুলনায় আদিবাসী বিষয়ে বর্তমানে গণমাধ্যমের ভূমিকা অত্যন্ত শক্তিশালী বলে বলা যায়। তবে এখনো কতিপয় গণমাধ্যম আদিবাসীদের বিষয়ে নেতিবাচক প্রচারনা চালিয়ে যাচ্ছে। এছাড়া সরকারী পর্যায়ে ও বৃহত্তর জনগোষ্ঠীর মধ্যে আদিবাসী বিষয়ে ব্যাপক ভুল ধারণা বিদ্যমান রয়েছে।

(২) শিক্ষা:

জাতিসংঘের কর্মপরিকল্পনায় শিক্ষা বিষয়ে জাতীয় পর্যায়ে যে সুপারিশ করা হয়েছে তা হলো, মাতৃভাষায়, দ্বৈত ভাষায় শিক্ষা এবং আন্ত:সাংস্কৃতিক শিক্ষা উপর গুরুত্বারোপ করা; সমন্বিত শিক্ষা কার্যক্রমে ও পাঠ্যক্রমে আদিবাসীদের শিক্ষাদান ও শিক্ষাগ্রহণ পদ্ধতি, ইতিহাস, ঐতিহ্য, অধিকার, আধ্যাত্মিকতা এবং বিশ্ব সম্পর্কে তাদের দৃষ্টিভঙ্গি ও তাদের জীবনধারণের পদ্ধতি অন্তর্ভুক্ত করা; শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে আদিবাসী শিক্ষকদের প্রবেশাধিকার বা অধ্যয়নের জন্য বৃত্তি প্রদানসহ রাষ্ট্রসমূহের বর্ধিত বাজেট বরাদ্দ করা ইত্যাদি।

আদিবাসীদের শিক্ষা ক্ষেত্রে নীতিগত বিষয়ে সরকারী কার্যক্রমের অন্যতম উল্লেখযোগ্য বিষয় হলো- ২০১০ সালের জাতীয় শিক্ষা নীতিতে আদিবাসী বিষয়ে বিশেষ বিধান অন্তর্ভুক্ত করা। শিক্ষানীতিতে উল্লেখ রয়েছে যে-

> "১৮. আদিবাসী শিশুরা যাতে নিজেদের ভাষা শিখতে পারে সেই লক্ষ্যে তাদের জন্য আদিবাসী শিক্ষক ওপাঠ্যপুস্তকের ব্যবস্থা করা হবে। এই কাজে, বিশেষ করে পাঠ্যপুস্তক প্রণয়নে, আদিবাসী সমাজকেসম্পৃক্ত করা হবে।১৯. আদিবাসী প্রান্তিক শিশুদের জন্য বিশেষ সহায়তার ব্যবস্থা করা হবে।২০. আদিবাসী অধ্যুষিত (পাহাড় কিংবা সমতল) যেসকল

এলাকায় প্রাথমিক বিদ্যালয় নেই সেসকলএলাকায় প্রাথমিক বিদ্যালয় স্থাপন করা হবে। যেহেতু কোনো কোনো এলাকায় আদিবাসীদের বসতিহালকা তাই একটি বিদ্যালয়ে পর্যাপ্ত শিক্ষার্থী ভর্তি হওয়ার সুযোগ সৃষ্টি করার লক্ষ্যে শিক্ষার্থী ওশিক্ষকদের আবাসিক ব্যবস্থার প্রয়োজন হলে সেদিকেও নজর দেওয়া হবে।"

জাতীয় শিক্ষা নীতিতে আদিবাসী শিশুদের শিক্ষা বিষয়ে উল্লেখিত বিধানাবলী নি:সন্দেহে যথেষ্ট ইতিবাচক বলা যায়। তবে শিক্ষা নীতিতে উল্লেখিত 'আদিবাসী শিশুরা যাতে নিজেদের ভাষা শিখতে পারে সেই লক্ষ্যে তাদের জন্য আদিবাসী শিক্ষক ও পাঠ্যপুস্তকের ব্যবস্থা করা হবে' এই বক্তব্য বেশ বিভ্রান্তিমূলক। কারণ আদিবাসীরা পরিবারের মধ্যে নিজেদের ভাষা শিখে থাকে। তাদের প্রয়োজন হচ্ছে 'নিজেদের ভাষায় শিক্ষা' গ্রহণের সুযোগ প্রদান করা। কিন্তু নীতিতে মাতৃভাষায় শিক্ষার বিষয়টি সুস্পষ্টভাবে আসেনি। অধিকন্তু শিক্ষানীতির এই পরিকল্পনাগুলো এখনো নীতিমালাতেই সীমাবদ্ধ রয়েছে। এখনো তা বাস্তবায়নের মুখে দেখেনি।বাংলাদেশ কর্তৃক অনুস্বাক্ষরিত আইএলও কনভেনশন নং ১০৭ এবং পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তি ১৯৯৭-এওআদিবাসী শিশুদের নিজস্ব মাতৃভাষায় শিক্ষা প্রদানের বিষয়টি স্বীকৃতি দেয়া হয়েছে। কিন্তু আদিবাসী ছেলেমেয়েদের নিজস্ব মাতৃভাষার মাধ্যমে শিক্ষার সুযোগ থেকে এখনো বঞ্চিত।

উচ্চ শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ভর্তির ক্ষেত্রে আদিবাসীদের শিক্ষার পশ্চাদপদতার কথা বিবেচনা করে সরকার আদিবাসী ছাত্র-ছাত্রীদের কোটা ব্যবস্থা গ্রহণ করে। এই কোটা ব্যবস্থা চালু আছে এডহক ভিত্তিতে; লিখিত বা আইনানুগ কোন নীতিমালা নেই। ফলতঃ যদি কোন আদিবাসী ছাত্র-ছাত্রী জেনারেল প্রতিযোগিতায় যোগ্যতা লাভ করে তাকেও কোটায় ঢুকিয়ে দেয়া হচ্ছে। এটা কোটার মূল উদ্দেশ্যকে ব্যাহত করে। আদিবাসী কোটা বিষয়ে সুনিদিষ্ট নীতিমালা না থাকায় কোন কোন বছর শিক্ষা প্রতিষ্ঠান কর্তৃপক্ষের সহানুভুতির উপর কোটা দেয়া না দেয়া নির্ভর করে। বিদেশে উচ্চ শিক্ষা গ্রহণ ও গবেষণার জন্যও সুনির্দিষ্ট কোন কোটা নেই। অপরদিকে আদিবাসী ছাত্র-ছাত্রীদের উচ্চ শিক্ষা ক্ষেত্রে প্রধান বাধা আর্থিক অস্বচ্ছলতা। এসব গরীব ও মেধাবী ছাত্র-ছাত্রীদের পর্যাপ্ত পরিমাণে আর্থিক সাহায্য দেয়ার সরকারীভাবে কোন ব্যবস্থা নেই।

(৩) স্বাস্থ্য:

জাতিসংঘের কর্মপরিল্পনায় বলা হয়েছে যে, আদিবাসীদের জন্য পর্যাপ্ত, কমিউনিটি ভিত্তিক এবং সংস্কৃতিগতভাবে উপযুক্ত ও সঙ্গতিপূর্ণ স্বাস্থ্যসেবা, স্বাস্থ্যশিক্ষা, পর্যাপ্ত ও আবাসনের কোন বৈষম্য ছাড়াই নিশ্চিত করতে হবে। ....আদিবাসী নারী, শিশু ও যুবক-যুবতিদের মৌলিক অধিকার ও জটিল প্রয়োজনের প্রতি সর্বোচ্চ অগ্রাধিকার দিতে হবে। এক্ষেত্রে বাংলাদেশ সরকারের প্রণীত ২০১১ সালের জাতীয় স্বাস্থ্য নীতি উল্লেখ করা যেতে পারে। তবে এ নীতিতে আদিবাসীদের স্বাস্থ্যসেবা সম্পর্কে কোন কিছুই উল্লেখ নেই।

অধিকাংশ আদিবাসীদের বসতি দুর্গম ও প্রত্যন্ত অঞ্চলে অবস্থিত হওয়ায় আদিবাসীরা, বিশেষ করে নারীরা সীমিত স্বাস্থ্যসেবা লাভ করে থাকে। বিভিন্ন আন্তর্জাতিক সংস্থার গবেষণায় দেখা গেছে যে, পার্বত্য চট্টগ্রামে শিশুরা কম ওজনে জন্মগ্রহণ করে থাকে। এটা কেবল শিশুদের দুর্বল স্বাস্থ্যের জন্য নয়, চরম পুষ্টীহীনতাও এর একটি অন্যতম কারণ। পার্বত্য চট্টগ্রাম শিশু মৃত্যুর হার জাতীয় গড় থেকে অনেক বেশী। এই চিত্র দেশের অন্যান্য অঞ্চলে বসবাসকারী আদিবাসী জাতিসমূহের বেলায় আরো বেশী করুণ তা নতুন করে বলার অপেক্ষারাখে না।

(৪) মানবাধিকার:

জাতিসংঘের কর্মপরিকল্পনায় জাতীয় পর্যায়ে মানবাধিকার বিষয়ে "আদিবাসীদের পূর্ণাঙ্গ ও অর্থবহ অংশগ্রহণের মাধ্যমে আদিবাসীদের প্রতি বৈষম্যমূলক প্রবিধানগুলো বাদ দেয়ার জন্য জাতীয় আইনগুলো সংস্কার করতে সরকারগুলোকে আহ্বান জানানো হয়েছে। ...আন্তর্জাতিক মানবাধিকার আইন ও বিচারব্যবস্থায় আন্তর্জাতিক মানদণ্ডের সাথে সঙ্গতি রেখে জাতীয় আইনগুলোতে আদিবাসীদের প্রথাগত বিচার ব্যবস্থাকে সমন্বিত করার জন্য বিবেচনা করতে হবে।"

২০১০ সালের জাতীয় মানবাধিকার কমিশনের কৌশলগত পরিকল্পনায় আদিবাসীদের উন্নয়ন ও মানবাধিকার বিষয়ে অনেক কর্মউদ্যোগের কথা উল্লেখ কথা হয়েছে যা নি:সন্দেহে প্রশংসনীয় বলা যেতে পারে। মানবাধিকার কমিশনের উক্ত কর্মপরিকল্পনায় প্রধান প্রধান আদিবাসী ও সংখ্যালঘু সংগঠনের সাথে গোলটেবিল বৈঠক আয়োজন করা;

আদিবাসী ও ট্রাইবাল জাতিগোষ্ঠী বিষয়ক আইএলও কনভেনশ নং ১৬৯ অনুস্বাক্ষর করা; আদিবাসী জাতিগোষ্ঠীর অধিকার বিষয়ক জাতিসংঘ ঘোষণাপত্র সমর্থনদানের জন্য সরকারের সাথে কাজ করা; দেশের সংবিধান বা আইনে স্বীকৃত আদিবাসী ও সংখ্যালঘুদের অধিকার নিশ্চিতকরণের জন্য অন্যান্য আদিবাসীদের সাথে যৌথভাবে কাজ করা ইত্যাদি বিষয়গুলো অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে।তবে জাতীয় মানবাধিকার কমিশনের চেয়ারম্যান আদিবাসীদের অধিকার বিষয়ে সোচ্চার হলেও আদিবাসীদের মানবাধিকার লঙ্ঘনের ঘটনা যথাযথ তদন্ত এবং তদন্তের ফলাফল প্রকাশের মাধ্যমে কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণের ক্ষেত্রে মানবাধিকার কমিশনকে অধিকতর কার্যকর ও শক্তিশালী পদক্ষেপ নিতে হবে।

দ্বিতীয় দশক চলাকালে সরকার অনেক সেক্টর-ভিত্তিক অনেক নীতিমালা (পলিসি) গ্রহণ করেছে। তার মধ্যে ২০০৫ সালের জাতীয় সমাজ কল্যাণ নীতি, ২০০৬ সালের জাতীয় খাদ্য নীতি, ২০০৯ সালের জাতীয় নবায়নযোগ্য জ্বালানী নীতি, ২০১০ সালের জাতীয় শিক্ষা নীতি, ২০১১ সালের জাতীয় নারী উন্নয়ন নীতি, ২০১১ সালের জাতীয় শিশু নীতি, ২০১২ সালের জাতীয় শ্রম নীতি ইত্যাদি উল্লেখযোগ্য। উল্লেখিত নীতিগুলোর মধ্যে জাতীয় শিক্ষা নীতি ও জাতীয় নারী উন্নয়ন নীতি ব্যতীত অন্যান্য জাতীয় নীতিগুলোতে আদিবাসী বিষয়ে কোন কিছুই উল্লেখ নেই। তবে শিক্ষা নীতি ও জাতীয় নারী উন্নয়ন নীতিতে আদিবাসী জাতিগোষ্ঠীর অধিকার সংক্রান্ত কিছু বিষয় অন্তর্ভুক্ত করা হয় যা অত্যন্ত আশাব্যাঞ্জক বলা যেতে পারে। উল্লেখ্য যে,জাতীয় নারী উন্নয়ন নীতিতে আদিবাসী নারী বিষয়ে অনেক উত্তম বিধান থাকলেও আদিবাসী নারীদের উপর চলমান সাম্প্রদায়িক সহিংসতা অবসানে কোন ব্যবস্থার কথা নেই এই নীতিতে।

দ্বিতীয় আদিবাসী দশকের সময় আদিবাসীদের সাথে প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে সম্পর্কিত অনেক আইন প্রণয়ন করা হয়েছে। সেগুলোর মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলো- ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠী সাংস্কৃতিক প্রতিষ্ঠান আইন ২০১০ ও বন্যপ্রাণী (সংরক্ষণ) আইন ২০১২। এসব আইন সরাসরি আদিবাসীদের প্রভাবিত করলেও আইন প্রণয়নের সময় সরকার পার্বত্য চট্টগ্রাম আঞ্চলিক পরিষদ, তিন পার্বত্য জেলা পরিষদ এবং সমতল ও পার্বত্যাঞ্চলের আদিবাসী সংগঠন বা প্রতিনিধিদের কাছ থেকে কোন মতামত গ্রহণ করেনি। এছাড়া গণপ্রতিনিধিত্ব (দ্বিতীয় সংশোধন) অধ্যাদেশ ২০০৮, স্থানীয় সরকার (উপজেলা পরিষদ) অধ্যাদেশ ২০০৮, স্থানীয় সরকার (পৌরসভা) আইন ২০০৯, স্থানীয় সরকার (ইউনিয়ন পরিষদ) আইন ২০০৯ প্রণয়নের সময় সরকারের তরফ থেকে পার্বত্য চট্টগ্রাম আঞ্চলিক পরিষদের কোন মতামত নেয়া হয়নি।২০০৮ সালে স্থানীয় সরকার পরিষদগুলোর আইন সংশোধনের সময় তত্ত্বাবধায়ক সরকারের তৎকালীন উপদেষ্টা এম শওকত আলীর প্রস্তাবের মধ্যে এসব স্থানীয় সরকার পরিষদগুলোকে নারীসহ আদিবাসীদের জন্য আসন সংরক্ষণের কথা উল্লেখ ছিল। কিন্তু সেটা চূড়ান্ত পর্যায়ে সেই প্রস্তাব গৃহীত হয়নি। এটাআইএলও কনভেনশন নং ১০৭, আদিবাসী অধিকার বিষয়ক জাতিসংঘ ঘোষণাপত্র ও ১৯৯৭ সালের পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তিতে সন্নিবেশিত মতামত ও সম্মতির অধিকার এবং সরকারব্যবস্থায় অংশগ্রহণ ও প্রতিনিধিত্বের অধিকারের সরাসরি লঙ্ঘন বলে বিবেচনা করা যায়। সর্বোপরি এটা আদিবাসীদের সাংস্কৃতিক ও ভাষাগত বৈচিত্র্যতার সাথে সঙ্গতিপূর্ণভাবে উন্নয়ন নীতি নির্ধারণের দ্বিতীয় দশকের লক্ষ্যের সাথেও বিরোধাত্মক বলে।

মহাজোটের প্রধান শরীক আওয়ামী লীগের নেতৃত্বাধীন সরকার ২০০৮ সালের নির্বাচনী ইশতেহারে 'আদিবাসী' শব্দটি উল্লেখ পূর্বক আদিবাসীদের জমি, জলাধার এবং বন এলাকায় সনাতনি অধিকার সংরক্ষণের জন্য বিশেষ ব্যবস্থা গ্রহণসহ ভূমি কমিশন গঠন; মানবাধিকার লঙ্ঘন, বৈষম্যমূলক সকল প্রকার আইন ও অন্যান্য ব্যবস্থার অবসান করা ও পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তি পূর্ণ বাস্তবায়নের অঙ্গীকার করে।[২০] কিন্তু নির্বাচনে জয়যুক্ত হয়ে ক্ষমতাসীন হওয়ার পর আওয়ামী লীগ সরকার আদিবাসী বিষয় সম্পূর্ণভাবে ইউ-টার্ন দেয় বা উল্টো পথে হাঁটা শুরু করে। বিশেষ করে নিজেদের নির্বাচনী ইশতেহারের বিপরীতে 'আদিবাসী' শব্দটি ব্যবহারের বিরুদ্ধে অবস্থান নেয়।

পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তি বাস্তবায়ন

২০০৮ সালের২৯ ডিসেম্বর জাতীয় নির্বাচনে জয়যুক্ত হয়ে ৫ বছর এবং গত ৫ জানুয়ারি নির্বাচনের মাধ্যমে সরকার গঠনের পর ৭ মাস মোট সাড়ে পাঁচ বছরের অধিক ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত থাকলেও আওয়ামী লীগ নেতৃত্বাধীন সরকার পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তির উল্লেখিত মৌলিক বিষয়সমূহ বাস্তবায়নে এগিয়ে আসেনি। গত ৫ জানুয়ারী নির্বাচনের পর দ্বিতীয়

[২০]নবম জাতীয় সংসদ ২০০৮, বাংলাদেশ আওয়ামী লীগের নির্বাচনী ইশতেহার-২০০৮, দিন বদলের সনদ।

মেয়াদে ক্ষমতায় আসার পর আজ সাত মাস অতিক্রান্ত হলেও সরকার চুক্তি বাস্তবায়নে উল্লেখযোগ্য কোনো পদক্ষেপ গ্রহণ করেনি, বরং পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তি পরিপন্থী ও জনবিরোধী আইন প্রণয়ন ও কার্যক্রম হাতে নিয়ে পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তি বাস্তবায়নের প্রক্রিয়াকে বাধাগ্রস্ত করে চলেছে। তার প্রকৃষ্ট উদাহরণ হলো- পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তির মৌলিক বিষয়গুলো বাস্তবায়ন না করে এবং পার্বত্য চট্টগ্রাম আঞ্চলিক পরিষদের সাথে কোনরূপ আলোচনা ও পরামর্শ ব্যতিরেকে সরকার একতরফাভাবে অর্ন্তবর্তীকালীন তিন পার্বত্য জেলা পরিষদ আইন সংশোধন, পার্বত্য চট্টগ্রাম উন্নয়ন বোর্ড আইন প্রণয়ন এবং আদিবাসী জুম্মদের অধিকার ও অস্তিত্বকে বিপন্ন করে ও পার্বত্য চট্টগ্রামের রাজনৈতিক স্থিতিশীলতাকে অনিশ্চিত রেখে রাঙ্গামাটিতে বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয় ও মেডিকেল কলেজ স্থাপনের উদ্যোগ দেয়া, যা সরকারের চরম অগণতান্ত্রিক, জনবিরোধী ও পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তি পরিপন্থী মানসিকতারই প্রতিফলন বলে নি:সন্দেহে বলা যেতে পারে।অপরদিকে পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তির ৭২টি ধারার মধ্যে ৪৮টি ধারার সম্পূর্ণ বাস্তবায়ন এবংতিন পার্বত্য জেলা পরিষদে ৩৩টি কার্যাবলীর মধ্যে ২১ থেকে ২৩ টি বিষয় হস্তান্তর করা হয়েছে বলে দাবি করে জনমতকে বিভ্রান্ত অপচেষ্টা চালাচ্ছে।

পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তি স্বাক্ষরের পর ১৭ বছর অতিক্রান্ত হলেও চুক্তির মৌলিক বিষয়গুলোর মধ্যে বিশেষত: পার্বত্য চট্টগ্রামের জুম্ম (উপজাতীয়) অধ্যুষিত অঞ্চলের বৈশিষ্ট্য সংরক্ষণ; পার্বত্য চট্টগ্রাম আঞ্চলিক পরিষদ ও তিন পার্বত্য জেলা পরিষদের আওতাধীন বিষয় ও কার্যাবলী কার্যকরকরণ এবং এসব পরিষদের নির্বাচন অনুষ্ঠিতকরণ; পার্বত্য চট্টগ্রামের ভূমি বিরোধ নিষ্পত্তিকরণ; আভ্যন্তরীণ জুম্ম উদ্বাস্তু ও প্রত্যাগত জুম্ম শরণার্থীদের জায়গা-জমি প্রত্যর্পণ ও পুনর্বাসন; সেনা শাসন 'অপারেশন উত্তরণ'সহ সকল অস্থায়ী ক্যাম্প প্রত্যাহার; অস্থানীয়দের নিকট প্রদত্ত ভূমি ইজারা বাতিলকরণ; পার্বত্য চট্টগ্রামের সকল চাকুরীতে জুম্মদের অগ্রাধিকারের ভিত্তিতে তিন পার্বত্য জেলার স্থায়ী অধিবাসীদের নিয়োগ; চুক্তির সাথে সামঞ্জস্য বিধানের জন্য অন্যান্য সংশ্লিষ্ট আইনসমূহ সংশোধন; সেটেলার বাঙালিদেরকে পার্বত্য চট্টগ্রামের বাইরে সম্মানজনকভাবে পুনর্বাসন ইত্যাদি বিষয়গুলো বাস্তবায়িত না হওয়ায় পার্বত্য চট্টগ্রাম সমস্যার সমাধান এখনো কাঙ্ক্ষিত পর্যায়ে অগ্রগতি লাভ করেনি। সরকার পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তি বাস্তবায়নে অব্যাহতভাবে প্রতিশ্রুতি দিয়ে চললেও প্রকৃত ও যথাযথ বাস্তবায়নের কোন উদ্যোগ নেই।বরঞ্চ এ মেয়াদকালে চুক্তি বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে সম্পূর্ণ উল্টো পথেই হাঁটতে শুরু করেছে পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তি স্বাক্ষরকারী সরকার।

সরকার পূর্ববর্তী মেয়াদের (২০০৯-২০১৩) শেষ পর্যায়ে পার্বত্য চট্টগ্রাম ভূমি বিরোধ নিষ্পত্তি কমিশন (সংশোধন) আইন ২০১৩ বিল ৯ম জাতীয় সংসদে উত্থাপন করলেও অবশেষে তা সংসদীয় কমিটিতে ঝুলিয়ে রেখে দেয়। অপরদিকে গত ১-৩ জুলাই ২০১২ বিভিন্ন মন্ত্রণালয়ের সচিবদের সাথে পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের তৎকালীন প্রতিমন্ত্রী দীপঙ্কর তালুকদার ও প্রধানমন্ত্রীর আন্তর্জাতিক বিষয়ক উপদেষ্টা ড. গওহর রিজভীর অনুষ্ঠিত এক সভারমাধ্যমে অহস্তান্তরিত বিষয়সমূহ তিন পার্বত্য জেলা পরিষদে হস্তান্তরের উদ্যোগ নিলেও তাও অকার্যকর অবস্থায় রেখে দেয়া হয়েছে। ঝুলিয়ে রাখা উপরোক্ত গুরুত্বপূর্ণ বিষয়গুলো বাস্তবায়নের উদ্যোগ না নিয়ে সরকার উল্টো পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তি পরিপন্থী ও জনবিরোধী আইন ও কার্যক্রমের উদ্যোগ নিয়েছে। বস্তুত: সরকার বর্তমানে পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তি বাস্তবায়নের কার্যক্রম সম্পূর্ণভাবে বন্ধ রেখেছে।

৬ষ্ঠ পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনায় আদিবাসী ও ট্রাইবাল জাতিগোষ্ঠী বিষয়ক আইএলও কনভেনশন নং ১৬৯ অনুস্বাক্ষরের কথা উল্লেখ থাকলেও সরকার তা বাস্তবায়নের কোন উদ্যোগ গ্রহণ করেনি। গত ২৯ এপ্রিল ২০১৩ জেনেভায় অবস্থিত জাতিসংঘের মানবাধিকার কাউন্সিলে ইউনিভার্সাল পিরিওডিক রিভিউ (ইউপিআর) এর আওতায় দ্বিতীয়বারের মতো বাংলাদেশের মানবাধিকার পরিস্থিতির পর্যালোচনার সময় সরকার আইএলও'র উক্ত কনভেনশন নং ১৬৯ অনুস্বাক্ষরের অস্বীকৃতি জানায়, যা ৬ষ্ঠ পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার সাথে বিরোধাত্মক বলে বিবেচনা করা যায়।

(৫) অর্থনৈতিক ও সামাজিক উন্নয়ন

মহাজোট সরকারের প্রণীত ৬ষ্ঠ পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনায় (২০১১-২০১৫)[২১] আদিবাসীদের উন্নয়ন ও মানবাধিকার বিষয়ে উল্লেখ রয়েছে। আদিবাসীদের বিষয়ে রূপকল্পে তাদের সামাজিক, রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক অধিকার

[২১]Sixth Five Year Plan (FY2011-FY2015) titling "Accelerating Growth and Reducing Poverty"

নিশ্চিতকরণ; নিরাপত্তা ও মৌলিক মানবাধিকারের নিশ্চয়তা বিধান; তাদের সামাজিক ও সাংস্কৃতিক পরিচিতি সুরক্ষা ও সংরক্ষণ করার বিষয়গুলো উল্লেখ রয়েছে। আদিবাসীদের শিক্ষা, স্বাস্থ্যসেবা, খাদ্য ও পুষ্ঠি, কর্মসংস্থান এবং ভূমি ও অন্যান্য সম্পদের উপর তাদের অধিকার সুরক্ষার কথাও উক্ত রূপকল্পে বলা হয়েছে। উক্ পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনায় পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তি বাস্তবায়ন, আইএলও'র কনভেনশন নং ১৬৯ অনুস্বাক্ষর করা ইত্যাদি পরিকল্পনার কথা উল্লেখ ছিল। তবে পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনায় অন্তর্ভুক্ত বিষয়গুলো এখনো পরিকল্পনা ও নীতির মধ্যে রয়ে গেছে। প্রকৃত বাস্তবায়ন থেকে এসব কর্মপরিকল্পনাগুলো এখনো অনেক দূরে অবস্থান করছে।

অপরদিকে প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ে সমতল অঞ্চলের আদিবাসীদের জন্য বিশেষ কার্যাদি বিভাগ বলবৎ থাকলেও উক্ত বিভাগে আদিবাসীদের অংশগ্রহণ ও অংশীদারিত্ব সম্পূর্ণ অনুপস্থিত। অর্থ বরাদ্দ, উন্নয়ন পরিকল্পনা গ্রহণ ও বাস্তবায়নে আদিবাসীদের কোন মতামতও নেয়া হয় না। উপজেলা পর্যায়ে প্রকল্প বাস্তবায়নের জন্য উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তার নেতৃত্বে ও উপজেলা প্রকৌশলীর সাচিবিক দায়িত্বে একটি ২০-সদস্যক কমিটি রয়েছে যেখানে আদিবাসীদের একজন প্রতিনিধি রাখা হয়েছে। উক্ত কমিটিতে আদিবাসী প্রনিতিধিকে নিজেদের মধ্যে নির্বাচিত বা মনোনীত করার পরিবর্তে জেলা প্রশাসক কর্তৃক মনোনীত করা হয় যা আদিবাসীদের অংশগ্রহণ, পরামর্শ ও সম্মতির অধিকারের সাথে বিরোধাত্মক। ফলে মাঠ পর্যায়ে অর্থ বরাদ্দের ক্ষেত্রে উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তার অনুকম্পার উপরই নির্ভর করে। আদিবাসীদের তরফ থেকে পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের উপদেষ্টা কমিটির মতো বিশেষ কার্যাদি বিভাগে আদিবাসীদের নিয়ে একটি উপদেষ্টা কমিটি গঠনের দাবি করা হলেও সরকার বরাবরই তা উপেক্ষা করে চলেছে। এটা আদিবাসীদের প্রতি বৈষম্যহীনতা, আদিবাসীদের অন্তর্ভুক্তিকরণ এবং পূর্ণাঙ্গ ও অর্থবহ অংশগ্রহণ সংক্রান্ত দ্বিতীয় দশকের প্রথম ও দ্বিতীয় লক্ষ্যের সাথে বিরোধাত্মক বলে বিবেচনা করা যায়।

বাংলাদেশের সংবিধানে বিশেষভাবে সুরক্ষিত ১৯৫০ সালের রাষ্ট্রীয় অধিগ্রহণ ও প্রজাস্বত্ব আইনে সমতল জেলাসমূহের আদিবাসীদের ভূমি অআদিবাসীদের কাছে হস্তান্তরের বাধানিষেধসমূহ সুস্পষ্টভাবে উল্লেখ থাকলেও এই আইনকে লঙ্ঘন করে গারো, খাসিয়া, রাখাইন, সাঁওতাল, ওঁরাও, মুণ্ডা, কোচ বা রাজবংশী প্রভৃতি আদিবাসী জনগোষ্ঠীর জায়গাজমি অআদিবাসীর কাছে হস্তান্তর হয়ে চলেছে। আওয়ামী লীগ সরকারের ২০০৮ সালের নির্বাচনী ইশতেহারে আদিবাসীদের জমি, জলাধার এবং বন এলাকায় সনাতনি অধিকার সংরক্ষণের জন্য বিশেষ ব্যবস্থা গ্রহণসহ ভূমি কমিশন গঠনের অঙ্গীকার করা হলেও সরকার এ বিষয়ে কোন পদক্ষেপ গ্রহণ করেনি। বিশেষ করে আইএলও কনভেনশন নং ১০৭ ও আদিবাসী অধিকার বিষয়ক জাতিসংঘ ঘোষণাপত্রে স্বীকৃত আদিবাসীদের প্রথাগত ভূমি অধিকারকে লঙ্ঘন করে সমতল অঞ্চলের আদিবাসীদের তাদের বংশ পরম্পরায় বসবাসরত জমি থেকে উচ্ছেদ করা হচ্ছে। সাম্প্রতিককালে আদিবাসীদের তাদের চিরায়ত ভূমি থেকে উচ্ছেদ করে এবং তাদের জীবন-জীবিকাকে বিপন্ন করে সেনাবাহিনী ও বিজিব কর্তৃক ক্যাম্প স্থাপন ও পর্যটন কেন্দ্র স্থাপন; গত ৩০ মে ২০১৪ স্থানীয় বাঙালি ভূমিদস্যুরা আদিবাসী খাসিদের জমি দখল করার উদ্দেশ্যে মৌলভীবাজার জেলার শ্রীমঙ্গল উপজেলার খাসিদের গ্রাম নাহার পুঞ্জির ৭৯টি খাসি পরিবারের উপর আক্রমণ; গত ৯ মে দিনাজপুরের নবাবগঞ্জে মোহাম্মদ হাবিবুর রহমান গং কর্তৃক নিরীহ সাঁওতাল আদিবাসী শ্রমিকদের উপর হামলা চালিয়ে অন্তত: ৭ জন নারীসহ ১১ জনকে আহত করা তার প্রকৃষ্ট উদাহরণ। এটা আদিবাসীদের জীবনমান উন্নয়ন সংক্রান্ত দ্বিতীয় দশকের লক্ষ্যকে বাধাগ্রস্ত করছে।

আদিবাসীদের জন্য সরকারী চাকুরীতে ৫% কোটা সংরক্ষণ অব্যাহত রাখা হলেও তা যথাযথভাবে কার্যকর করা হয়নি। যেমন ২৪তম বিসিএস থেকে ৩৩তম বিসিএসের ১০টি ব্যাচে ট্রাইবাল কোটায় ৫% হারে বরাদ্দকৃত ২০৫১ জনের মধ্যে মাত্র ২৭৫ জন আদিবাসী প্রার্থী নিয়োগ দেয়া হয়েছে।[২২] উল্লেখিত তথ্যে আইএলও কনভেনশন নং ১৯৭-এ স্বীকৃত আদিবাসীদের কর্মসংস্থানের অধিকারের লঙ্ঘন বলে বিবেচনা করা যায়। তবে এটা স্বীকার করতে হবে যে, আগের যে কোন সময়ের তুলনায় বিগত কয়েকটি বছরে বিসিএস ক্যাডার সার্ভিসে আদিবাসীদের নিয়োগের সংখ্যা বৃদ্ধি পেয়েছে। এটা আদিবাসীদের অংশগ্রহণ ও জীবনমান উন্নয়ন সংক্রান্ত দ্বিতীয় দশকের গৃহীত লক্ষ্যকে ত্বরান্বিত করছে বলে বলা যেতে পারে।

[২২]Present Status of Social, Economic and Cultural Rights of Indigenous Peoples, Anurug Chakma, Human Rights Situation of Indigenous Peoples in Bangladesh, Kapaseeng Foundation, 2014

আদিবাসী দশক এবং দেশের নাগরিক সমাজঃ

দ্বিতীয় আন্তর্জাতিক আদিবাসী দশক চলাকালে পূর্বের মতো দেশের প্রগতিশীল, গণতান্ত্রিক ও অসাম্প্রদায়িক শক্তির সাথে আদিবাসী জনগোষ্ঠীর সম্পর্ক জোরদার হয়েছে। দেশের বিভিন্ন স্থানে আদিবাসীদের উপর সংঘটিত মানবাধিকার লঙ্ঘন ও ভূমি জবরদখলের বিরুদ্ধে জাতীয় পর্যায়ে প্রগতিশীল ও অসাম্প্রদায়িক রাজনৈতিক নেতৃত্ব, বুদ্ধিজীবী ও সাংস্কৃতিক কর্মীরা প্রতিবাদ-সমাবেশে প্রত্যক্ষভাবে অংশগ্রহণ করেছেন এবং একাত্মতা ঘোষণা করে আদিবাসীদের সাহস যুগিয়েছেন। এক্ষেত্রে আদিবাসী বিষয়ক সংসদীয় ককাস গঠন এবং এই ককাসের উদ্যোগে 'বাংলাদেশ আদিবাসী অধিকার আইন, ২০১৪' নামে একটি আইন খসড়া করার উদ্যোগ বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। তবে ককাসের এই আইন প্রণয়নের উদ্যোগ কতটুকু বাস্তবরূপ লাভ করবে তা নিয়ে যথেষ্ট সন্দেহ রয়েছে। কেননা গত ২৮ জুলাই ২০১৩ তারিখে পররাষ্ট্র সচিবের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত সভায় 'বাংলাদেশ আদিবাসী অধিকার আইন, ২০১৪' সংক্রান্ত কোন আইন যাতে জাতীয় সংসদে উত্থাপনের প্রস্তাব এলে তা গ্রহণ করা না হয় তার জন্য জাতীয় সংসদের স্পিকারকে অনুরোধ জানানো হয়।

দেশের গণতান্ত্রিক, অসাম্প্রদায়িক ও প্রগতিশীল রাজনৈতিক দল ও নাগরিক সমাজ আদিবাসীদের অধিকার আদায়ের ক্ষেত্রে বর্তমানে অনেক সোচ্চার হলেও এসব দল ও গোষ্ঠী নিজস্ব কর্মসূচী নিয়ে আদিবাসীদের অধিকার আদায়ের আন্দোলনে এগিয়ে আসেনি। এযাবৎ আদিবাসী সংগঠনের উদ্যোগে আহুত কর্মসূচীতে যোগ দিয়ে কেবল আদিবাসীদের অধিকারের প্রতি সংহতি ও একাত্মতা প্রকাশের মধ্যে এসব দল ও সংগঠনের কর্মসূচী সীমাবদ্ধ রয়েছে।

উপসংহার

জাতিসংঘ কর্তৃক ঘোষিত ২০১৪ সালের আদিবাসী দিবসের প্রতিপাদ্য বিষয় "Bridging the Gap: Implementing the Rights of Indigenous Peoples"-এর সাথে সঙ্গতি রেখে বাংলাদেশ আদিবাসী ফোরাম এ বছরের প্রতিপাদ্য বিষয় নির্ধারণ করেছে, "আদিবাসী অধিকার প্রতিষ্ঠায় মুক্তিকামী জনতার সেতুবন্ধন।"জাতিসংঘের এ প্রতিপাদ্য বিষয়ের উদ্দেশ্য হলো জাতীয় ও আন্তর্জাতিক পর্যায়ে একসাথে কর্মরত সরকার, জাতিসংঘ ও জাতিসংঘের বিশেষায়িত সংস্থা, আদিবাসী জাতিগোষ্ঠী ও তাদের সংগঠন এবং অন্যান্য সংশ্লিষ্ট পক্ষগুলোর নীতিমালা ও কর্মসূচী গ্রহণের মাধ্যমে আদিবাসী জাতিগোষ্ঠীর অধিকার বাস্তবায়নের গুরুত্বকে তুলে ধরা।

আন্তর্জাতিক মানবাধিকার আইনে স্বীকৃত অনেক অধিকার বাংলাদেশ সরকার এখনো বাস্তবায়ন করেনি। আদিবাসী ও ট্রাইবাল জনগোষ্ঠী বিষয়ক আইএলও কনভেনশন নং ১০৭ এবং আদিবাসী জাতিগোষ্ঠীর অধিকার বিষয়ক জাতিসংঘ ঘোষণাপত্রে আদিবাসীদের ন্যূনতম অধিকার সন্নিবেশ করা হয়েছে। কিন্তু সেই কনভেনশন ও ঘোষণাপত্র বাস্তবায়নেও বাংলাদেশ আশানুরূপভাবে এগিয়ে আসছে না। জাতিসংঘের দ্বিতীয় আদিবাসী দশক এ বছর শেষ হতে চলেছে। আদিবাসীদের অধিকার প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে বাংলাদেশে এখনো ব্যাপক ফারাক রয়েছে। তাই আইএলও কনভেনশন নং ১০৭ এবং আদিবাসী জাতিগোষ্ঠীর অধিকার বিষয়ক জাতিসংঘ ঘোষণাপত্র বাস্তবায়নে বাংলাদেশকে সদিচ্ছা ও আন্তরিকতা নিয়ে এগিয়ে আসতে হবে।

কোন আন্তর্জাতিক মানবাধিকার আইন (কনভেনশন) অনুস্বাক্ষর করলে রাষ্ট্রের বাধ্যগত দায়িত্ব হচ্ছে সেই কনভেনশনে স্বীকৃত অধিকার জাতীয় আইনগুলোতে সন্নিবেশ করা বা প্রয়োজনে এ সংক্রান্ত স্বতন্ত্র আইন প্রণয়ন করা। কিন্তু সরকার এখনো আইএলও'র কনভেনশন নং ১০৭-এ স্বীকৃত অধিকারগুলো সংবিধানে যেমন সন্নিবেশ করেনি, তেমনি জাতীয় আইনগুলোতে সেই মানের অধিকারগুলো সন্নিবেশ করেনি বা বিশেষ কোন আইনও প্রণয়ন করেনি। তাই আদিবাসী বিষয়ক সংসদীয় ককাসের প্রস্তাবিত "বাংলাদেশ আদিবাসী অধিকার আইন"টি জাতীয় সংসদে পাশ করার ক্ষেত্রে বাংলাদেশ সরকারকে ইতিবাচকভাবে এগিয়ে আসা দরকার। দ্বিতীয়তঃ ২০০৯ সালে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা যে আদিবাসী জাতিগোষ্ঠীর অধিকার সংক্রান্ত জাতিসংঘ ঘোষণাপত্র বাস্তবায়নের সদিচ্ছা ব্যক্তি করেছেন তা কার্যে রূপায়ণের উদ্যোগ নিতে হবে।

দ্বিতীয় দশকের গৃহীত লক্ষ্যকে ত্বরান্বিত করার জন্যসংবিধান সংশোধনের মাধ্যমে ৫৪টির অধিক আদিবাসী জাতিসমূহের জাতিসত্তা, ভাষা ও সংস্কৃতির সাংবিধানিক স্বীকৃতি প্রদান করা; পার্বত্য চট্টগ্রামের রাজনৈতিক,

অর্থনৈতিক, সামাজিক, সাংস্কৃতিক ও ধর্মীয় অধিকারের নিরাপত্তার জন্য পার্বত্য চট্টগ্রামের বিশেষ শাসিত আদিবাসী অঞ্চলের মর্যাদা সাংবিধানিকভাবে প্রদান করা; পার্বত্য চট্টগ্রামের সংসদীয় আসনসমূহসহ দেশের আদিবাসী অধ্যুষিত অঞ্চলগুলোতে আদিবাসী জাতিসমূহের জন্য জাতীয় সংসদের আসন ও স্থানীয় সরকার পরিষদে আসন সংরক্ষণ করা; আদিবাসী জাতিসমূহের সাংবিধানিক ও আইনী রক্ষাকবচ যাতে আদিবাসী জাতিসমূহের সম্মতি ছাড়া সংশোধন বা বাতিল করা না হয় তার সাংবিধানিক গ্যারান্টি প্রদান করা; আদিবাসী জাতিসমূহের ঐতিহ্যগত ভূমি অধিকারসহ ভূমি, ভূখণ্ড ও প্রাকৃতিক সম্পদের উপর আদিবাসী জাতিসমূহের অধিকার সাংবিধানিকভাবে স্বীকৃতি প্রদান করা এবং সর্বোপরি ১৯৯৭ সালে স্বাক্ষরিত পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তি এবং এই চুক্তির অধীনে প্রণীত আইনসমূহকে সাংবিধানিকভাবে স্বীকৃতি প্রদান করার মাধ্যমে আদিবাসীদের অধিকার প্রতিষ্ঠায় যে ফারাক রয়েছে তার অবসান করা সম্ভব হতে পারে।

আগামী ২২-২৩ সেপ্টেম্বরে জাতিসংঘের সাধারণ পরিষদের একটি উচ্চ পর্যায়ের পূর্ণাঙ্গ অধিবেশন অনুষ্ঠিত হতে যাচ্ছে যা আদিবাসী বিষয়ক বিশ্ব সম্মেলন নামে অভিহিত করা হচ্ছে[২৩]। এ বিশ্ব সম্মেলনের মূল উদ্দেশ্য হলো আদিবাসী জাতিগোষ্ঠীর অধিকার বিষয়ক জাতিসংঘ ঘোষণাপত্র এবং দ্বিতীয় আন্তর্জাতিক আদিবাসী দশকের অভীষ্ঠ লক্ষ্য ত্বরান্বিত করা। সাধারণ পরিষদের এ উচ্চ পর্যায়ের পূর্ণাঙ্গ অধিবেশন থেকে আদিবাসী জাতিগোষ্ঠী সংক্রান্ত ভবিষ্যত কর্মপরিকল্পনা বিষয়ক একটি কর্মসূচী-ভিত্তিক দলিল বেরিয়ে আসবে বলে আশা করা যায়।

আদিবাসী বিষয়ক বিশ্ব সম্মেলনের প্রস্তুতি হিসেবে গত ২০১৩ সালের ১০-১২ জুন নরওয়ের আল্টা শহরে অনুষ্ঠিত আদিবাসীদের বিশ্ব প্রস্তুতি সভায়গৃহীত ঘোষণাপত্র (আউটকাম ডকুমেন্ট) অনুসারে অনুষ্ঠিতব্য বিশ্ব সম্মেলনে আদিবাসী অধিকার প্রতিষ্ঠাকরণ সংক্রান্ত একটি কর্মসূচী-ভিত্তিক দলিল যাতে বেরিয়ে আসতে পারে তার জন্য বাংলাদেশ সরকার সর্বাত্মক ইতিবাচক ভূমিকা পালন করবে বলে দেশের আদিবাসীরা আশা করে।

তারিখ: ৮ আগস্ট ২০১৪

[২৩]A high-level plenary meeting of the General Assembly to be known as the World Conference on Indigenous Peoples